ANTARVIDYA
ISSN: 3107-7447
https://www.debracollege.ac.in/antarvidya/Index.aspx

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.009.2026

বঙ্কিম মুখার্জী (১৮৯৭-১৯৬১) : এক বিস্মৃতপ্রায় বিপ্লবী-কমিউনিস্ট

শুভঙ্কর দেবনাথ
পি এইচ. ডি. গবেষক, স্টেট জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো, ইতিহাস বিভাগ, রবিন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
dsubhankar937@gmail.com

Submitted on: 08/03/2026
Accepted on: 28/06/2026

সারাংশ

বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলা হতে মুক্তিলাভের আশায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার স্বাদ খুব সহজেই ভারতবাসী পায়নি। সুদীর্ঘ সংগ্রাম, বহু আত্মবলিদান এবং সংগঠিত জনরোধের মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। আবার জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থাকে কেন্দ্র করে সেই সময়ে কয়েকটি ধারা যেমন-নরমপন্থা, চরমপন্থা এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে, যেগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে অবিভক্ত বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিপ্লববাদের ধারা বিশেষভাবে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস ও সত্যাগ্রহের আদর্শকে সামনে রেখে যে আন্দোলন শুরু হয় তা বাংলার জনসমাজকে অনুপ্রাণিত করে। এরই সমান্তরালে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের প্রভাব ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে প্রতিভাত হতে দেখা যায়, যখন মার্কস-লেনিনবাদের তত্ত্বকে হাতিয়ার করে ভারতীয় জনগণকে জাতীয় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়াস নেওয়া হয়। এর সূত্রেই ১৯২০ দশকে কমিউনিস্ট মতাদর্শ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাংলার রাজনীতিতেও বহু যুবক মার্কসীয় আদর্শে দীক্ষিত হন এবং ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে থাকে, যেগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ১৯৩০ -এর দশকে যে সকল বাঙালি কমিউনিস্ট নেতার নাম জানা যায় তার মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হলেন বঙ্কিম মুখার্জী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল তাঁর সম্পর্কে তেমনভাবে কোনরকম চর্চা লক্ষ্য করা যায়না। তিনি একপ্রকার স্মৃতির অন্তরালে থেকে গেছেন। আলোচ্য এই প্রবন্ধে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর জীবনের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন ঘটনা, কৃষক-শ্রমিক নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা, জীবনাদর্শ এবং কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে তৎকালীন সময়ে তাঁর যে অবদান ছিল সেই বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হবে।

সূচক শব্দসমূহ- বিংশ শতক, বিস্মৃত, কমিউনিস্ট, বাংলা, বঙ্কিম মুখার্জী, কৃষক-শ্রমিক নেতা, ট্রেড ইউনিয়ন।

ভুমিকা

বিংশ শতক হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ সময়সারণী। সাধারণত এই সময়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং তা আরও দৃঢ় ও সংগঠিত রূপ নেয়। অবশ্য বিগত শতকের বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আপাতমন্থর মূর্মুষ, স্বাধীনতা আন্দোলন কোন দিশায় এগোবে তা নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। এহেন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে এক উজ্জ্বল

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.009.2026

জ্যোতিষ্ক হলেন বঙ্কিম মুখার্জী। ভারতবর্ষের শ্রমিক, কৃষক ও কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত ও সংগ্রামী বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছে, তখন যাঁরা এই কাজে নেতৃত্বের দায়িত্বে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী। তিনি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এক সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাংলা কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রের পরেই তাঁর স্থান ছিল জাতীয় কংগ্রেসে।[১] কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করলেও পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট নেতারূপে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সর্বোপরি ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণ মানুষের কাছে "প্রথম বঙ্কিম মুখার্জীর পার্টি" নামেই পরিচিত ছিল।[২] এতদ্‌সত্ত্বেও এমন এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির সম্পর্কে আমাদের জানার পরিসর খুবই স্বল্প। প্রবন্ধে প্রধানত বাংলার ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বিস্মৃতপ্রায় রাজনৈতিক নেতার জীবনাদর্শ, কার্যক্রম এবং বাংলার রাজনীতিতে তাঁর অবদান তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী এক উজ্জ্বল নাম। বাংলায় সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচার ও আন্দোলন সংগঠনে যাঁরা পুরোভাগে ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরসম্পন্ন বঙ্কিম মুখার্জী সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। শ্রমিক সমাবেশে, কৃষক সমাবেশে তিনি যেমন যুক্তি দিয়ে শ্রোতাদের কাছে বক্তব্য বোঝাবার ক্ষমতা রাখতেন, তারই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী সমাবেশেও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতেন। বিধানসভায় তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য জেলা থেকে উৎসাহী শ্রোতারা আসতেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বঙ্কিম মুখার্জী কংগ্রেস সমর্থক ও বামপন্থী উভয় শিবিরেই সম্মানিত ছিলেন। তিনি পন্ডিত জহরলাল নেহেরু, বিধানচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু সকলের যেমন ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরাও তাঁকে সম্মান করতেন। অপরদিকে শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতিতে সভাপতি পদে বৃত ছিলেন এবং বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পুরোভাগে ছিলেন। বিশ শতকের কুড়ির, ত্রিশের ও চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে বঙ্কিম মুখার্জীর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

প্রাথমিক জীবন

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মে হাওড়া জেলার বেলুড়ে মাতামহের বাড়িতে বঙ্কিম মুখার্জীর জন্ম হয়।[৩] পৈত্রিক বাড়ি নিবাস ছিল বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থানার কচুয়া গ্রামে। পিতা যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা বিভাবতী দেবী। পাঁচ বছর বয়সে বাগবাজারে ১৩ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে মামার বাড়িতে চলে আসেন এবং সেখানেই তাঁর বাল্য ও শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। প্রথমে শ্যামবাজার এ.ভি. স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা নেন এবং পরে হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (মেট্রিকুলেশন) পাস করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এস.সি-তে গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক পান। পরে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে এম.এস.সি-তে ভর্তি হন। ছাত্র জীবনেই তিনি বিপ্লবী কার্যদলে যুক্ত হন[৪] এবং উচ্চ শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি উত্তরপ্রদেশে গিয়ে ভারত মুক্তির সংগ্রামে যোগ দেন।

বঙ্কিম মুখার্জীর রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্বের সূত্রপাত হয় উত্তরপ্রদেশের এটোয়া অঞ্চল থেকে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আবাল্য বন্ধু রাধারমন মিত্রের সাথে উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায় গিয়ে ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন।[৫] এরই সমান্তরালে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এলাহাবাদে ১৮ মাসের কারাদণ্ড পান।[৬] রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার দরুন এটোয়া মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন। কংগ্রেস রাজনীতিতে অংশগ্রহনের সূত্রে বঙ্কিম মুখার্জী মতিলাল নেহেরু, জহরলাল নেহেরু প্রমুখের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মতিলাল নেহেরুর নির্দেশে তিনি বাংলায় ফিরে আসেন ও কংগ্রেস স্বরাজ্য পার্টির হয়ে কাজ শুরু করেন। সেই সময়েও বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস

রাজনীতিতে স্বরাজ্যদলের প্রভাব অনেকটাই অটুট ছিল। সেই সময় থেকে তিনি আজীবন বাংলার রাজনীতি, কৃষক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।

বাংলার শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন ও নেতৃত্বদান

১৯২০-এর দশকে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার আসে এবং AITUC (All India Trade Union Congress) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। এই দশকের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রসারের সমান্তরালে অসংখ্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠতে থাকে এবং তা শ্রমিক সংগ্রামে এক নব উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে আসার পর বঙ্কিম মুখার্জী কংগ্রেসী রাজনীতিতে যুক্ত থাকলেও ক্রমশই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা ছিল অধিক। এমনকি তৎকালীন ইংরেজ কমিউনিস্ট নেতা ফিলিপ স্প্রাটের সাম্যবাদ চর্চার ক্লাসেও বঙ্কিম মুখার্জী উপস্থিত থাকতেন।[৭] ধীরে ধীরে তিনি বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ভীষণভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। তৎকালীন বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটারি কিশোরীলাল ঘোষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। এই সময় (১৯২৮-২৯) বাংলার দুটি বড় বিদেশি মালিকানাধীন জুট মিলে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল। একটি চেঙ্গাইলের লাডলো জুট মিলে, অপরটি বাউরিয়ায় ফোর্ট গ্লস্টার মিলে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গাইলের লাডলো জুট মিলে একটি স্বল্পস্থায়ী ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মঘট ভেঙ্গে গেলে কিছু শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। এর প্রতিবাদে মিলের দশ হাজার শ্রমিক বিক্ষুব্ধ হয়ে কলকাতার বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে লাডলো জুটমিল ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। সেই ইউনিয়নের প্রথম সম্পাদক হন বঙ্কিম মুখার্জী।[৮] এর ফলে চেঙ্গাইল জুট মিলের আমেরিকান মালিক ও তার ম্যানেজার ওয়াশিংটন ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রমিকদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করেন। মিলের দশ হাজার শ্রমিক ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল বঙ্কিম মুখার্জীর নেতৃত্বে আরেকটি ধর্মঘট সংগঠিত করে মালিকের অত্যাচারের সমুচিত জবাব দেন।

চেঙ্গাইলে ইউনিয়ন গড়ে উঠলে বাউরিয়ার ফোর্ট গ্লস্টার কোম্পানি বিপদের সংকেত পান। কোম্পানি মালিকপক্ষ কিছুতেই বাউরিয়ার ইউনিয়ন গড়তে দিতে রাজী ছিলেন না। মালিকের সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ করে ঐ বছরের (১৯২৮) ১৫ই জুলাই শ্রমিকেরা বাউরিয়া চটকল মজদুর ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬ই জুলাই সমস্ত শ্রমিক চটকল থেকে বেরিয়ে এসে এক সুদীর্ঘ ধর্মঘটে অবতীর্ণ হন। ছয়মাস ব্যাপী দীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালানোর পরেও ফোর্ট গ্লস্টার মিলের ধর্মঘট ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। ব্যর্থ হলেও, শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ধর্মঘটের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জওহরলাল নেহেরু বাউরিয়ায় উপস্থিত হয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন করেন।

চেঙ্গাইল ও বাউরিয়ার ধর্মঘট যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল তাতে সমস্ত চটকলে একটি সাধারণ ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। কেননা ইতিমধ্যে সমস্ত চটকলে কাজের ঘন্টা পাঁচ দিনের সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ছয়দিনের সপ্তাহে ৬০ ঘন্টা করা হয়েছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ই জুলাই সমস্ত চটকলের শ্রমিকেরা মিল ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধর্মঘটে অবতীর্ণ হন। শেষপর্যন্ত এটি একটি সাধারণ ধর্মঘটের চেহারা নেয়। চটকলের প্রায় ৩০-৪০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়েন। এই ধর্মঘট পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সাথে বঙ্কিম মুখার্জীর নেতৃত্ব ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কৃষক-শ্রমিক পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউস) ২১,২২ ও ২৩ শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্কিম মুখার্জী ও রাধারমন মিত্র ওয়ার্কাস অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির প্রত্যক্ষ সদস্য না হলেও সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।[৯] এরই কয়েকদিন পর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পার্ক

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.009.2026

সার্কাস ময়দানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন বসে। বিগত বছরে মাদ্রাজ অধিবেশনে গৃহীত "পূর্ণ স্বাধীনতার" প্রস্তাব কলকাতা অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য আলোচ্য সূচীতে ছিল। সদ্য-জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে রাজনৈতিক দাবীতে শামিল হবার একটা সুযোগ আসে। 'পূর্ণ স্বাধীনতার' প্রস্তাব কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গ্রহণ করার দাবিতে ৩০ হাজার শ্রমিক-কৃষকের একটি মিছিল মনুমেন্ট ময়দান থেকে অধিবেশনস্থলে আসার জন্য রওনা হয়। মিছিলের ডাক দিয়েছিল ক্যালকাটা ট্রামওয়েমেন্স ইউনিয়ন, বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে লেবার ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আরও সংগঠন। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন মুজাফফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জী, শিবনাথ ব্যানার্জি, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, রাধারমন মিত্র, কিরণচন্দ্র মিত্র এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।[১০] অধিবেশনের প্রবেশ পথের সম্মুখে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেস অধিবেশনের স্বেচ্ছাসেবকেরা মিছিলের গতিরোধ করে। বাধা অতিক্রম করেই ওই বিশাল মিছিল অধিবেশন প্যান্ডেলে প্রবেশ করে। অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী, জওহারলাল নেহেরু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজি বঙ্কিম মুখার্জীকে কাছে ডেকে নেন এবং তাঁকেই মিছিলের সামনে কংগ্রেসের পক্ষে বক্তব্য রাখতে বলেন। সেদিন জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। বঙ্কিম মুখার্জী, আর. এস. নিম্বকর ও অন্যান্যরা তাঁদের ভাষণে অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব গ্রহণ করার দাবি তোলেন।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল কলকাতার মানুষ এক অভিনব ব্যারিকেড লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হন। লড়াই ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায়, বিশেষ করে শিয়ালদহ-হ্যারিসন রোড ধরে কলেজস্ট্রীট, আরো ছাড়িয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ, আবার সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে কলুটোলা স্ট্রীট পর্যন্ত। ব্যারিকেড লড়াইয়ের একদিকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট -এর পরিচালনায় বিশাল পুলিশবাহিনী এবং অন্যপক্ষে 'কলকাতা কার্টার্স ইউনিয়ন' এর নেতৃত্বে হাজার হাজার মোষ-টানা গাড়ির গাড়োয়ান ও গাড়ির মালিক। সে সময় কলকাতা শহরে মোষ-টানা গাড়িতেই মালপত্র বহন করা হত। মোষের গাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। স্বাভাবিকভাবে গাড়ির গাড়োয়ানের সংখ্যা ও গাড়ির মালিকের সংখ্যা বিশাল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার একটি আইন চালু করে অত্যাধিক গরমের অজুহাতে এপ্রিল, মে ও জুন তিন মাস বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত রাস্তায় মোষের গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ করে। ফলে খেটে খাওয়া গরীব মানুষের রুজির ওপর আঘাত নেমে আসে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার আর এক ধাপ এগিয়ে 'পশুক্লেষ নিবারণী আইন' জারি করে বছরে তিন মাসের জায়গায় ছয়মাস অর্থাৎ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত মোষের গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মোষ-টানা গাড়ির গাড়োয়ান ও গাড়ির মালিকদের কঠিন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অফিসে 'কলকাতা কার্টার্স ইউনিয়ন' গঠিত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি হন বঙ্কিম মুখার্জী, সম্পাদক আব্দুল মোমিন, সহ-সম্পাদক কিশোর সিং ও আব্দুল খালেক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হন স্বামী বিশ্বানন্দ। অ্যালবার্ট হলে(সভাকক্ষে) গাড়োয়ান ও মালিকদের প্রথম মিলিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মদনমোহন বর্মন। প্রধান বক্তা হিসাবে বঙ্কিম মুখার্জী ইংরেজ সরকারের অত্যাচারী শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করে ওই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানান। সংগ্রাম চলাকালীন অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও গ্রেফতার হন এবং এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত হন।[১১]

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২১-২৩শে জানুয়ারি জামশেদপুরে অল ইন্ডিয়া রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যবাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মীরাট মামলায় বন্দীদের সাজা দেওয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত কারখানা ও রেল শ্রমিকদের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বঙ্কিম মুখার্জী, সোমনাথ লাহিড়ী ও সরদেশাই প্রচারপত্র বিলি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি মীরাট দিবস পালনের আহ্বান জানান।

তিরিশের দশকের অর্থনৈতিক মহামন্দার বিরূপ প্রভাব ভারতবর্ষেও প্রতিভাত হয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনে ভাটার টান দেখা যায়।[১২] ১৯৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থনৈতিক মন্দার পরিস্থিতি কিছুটা স্থিত

হলে বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ভারতবর্ষেও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে শ্রমিক শ্রেণী ব্যাপক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। এহেন পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার চটকল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট ছিল শীর্ষে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ই মে পর্যন্ত ৭৪ দিন ব্যাপী একটি বিশাল চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মঘটে ২ লক্ষ ২৫ হাজার চটকল শ্রমিক যুক্ত ছিলেন। শ্রমিকদের দাবি ছিল অর্থনৈতিক মন্দার নামে যে মজুরি হ্রাস করা হয়েছিল তা অবিলম্বে বন্ধ করে পূর্ণ বেতন দিতে হবে, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে এবং ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ করতে হবে। এই ধর্মঘট পরিচালনা করে এক যুক্ত স্ট্রাইক কমিটি যাতে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, মুজাফফর আহমদ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শিবনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতা।[১৩] চটকল শ্রমিকদের এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরু প্রমূখ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এক বিবৃত দিয়েছিলেন যা অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১৪]

চটকল ধর্মঘটের পরপরই রানীগঞ্জ পেপার মিলকে কেন্দ্র করে আরেকটি উল্লেখযোগ্য শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। বল্লভপুরে অবস্থিত রাণীগঞ্জ পেপার মিলের দেড় হাজার শ্রমিক ছাঁটাই -এর কারণে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর থেকে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটের আগের দিন বঙ্কিম মুখার্জী রানীগঞ্জে আসেন এবং বিশাল জনসভায় তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় এক ঘন্টার অধিক হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। এছাড়া তাঁর উদ্যোগে 'রাণীগঞ্জ পেপার মিল ওয়াকার্স ইউনিয়ন' গঠিত হয়। যার সভাপতি হন বঙ্কিম মুখার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক নিত্যানন্দ চৌধুরী এবং সহকারী সম্পাদক সুকুমার ব্যানার্জি । ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এক দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বাত্মক ধর্মঘট এই পেপার মিলে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই নভেম্বর মালিক কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট ভাঙার উদ্যোগ নেন। সেদিনই এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যা রানীগঞ্জের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে যায়। মিলের ইঞ্জিনিয়ার ব্রাউন ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর ট্রাক চালিয়ে দেয় এবং ইউনিয়নের সম্পাদক সুকুমার ব্যানার্জি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান। এই ঘটনা শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার করে। ১৬ই নভেম্বর বঙ্কিম মুখার্জী ও আব্দুল মোমিন রানীগঞ্জে আসেন এবং ওই দিন ইউনিয়নের জরুরী মিটিং ডাকা হয়। সারা রানীগঞ্জে হরতাল পালিত হয় এবং শহীদদের নামে শপথ নিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ধর্মঘট ভাঙতে মালিকপক্ষ রানীগঞ্জে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিলেও ধর্মঘট ভাঙতে পারেনি। এই ধর্মঘটের নেতৃত্বের ভূমিকায় বঙ্কিম মুখার্জীর অবদান অবিস্মরণীয়।[১৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে অধিকাংশ শিল্পে শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বাড়ে যুদ্ধের রসদ যোগাতে। ফলে শ্রমিকরা যুদ্ধভাতা, মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। সেই সময় বাংলায় প্রতিটি অঞ্চলে শ্রমিক জনসভায় সুবক্তা হিসাবে বঙ্কিম মুখার্জীকে ডাকা হত। ডাঃ নরেশ ব্যানার্জি উল্লেখ করেছেন যে- "আমি এবং কমরেড জড়ান গাঙ্গুলী হুগলী চটকল, পোর্ট শ্রমিক, হাইড রোডে লোহা কারখানা ও ব্রুকবন্ড শ্রমিক ইউনিয়নের সভায় ভাষণ দেবার জন্য কয়েকবার বঙ্কিমদাকে নিয়ে গিয়েছিলাম"।[১৬] ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিম মুখার্জী বার্নপুরে লোহা কারখানায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এছাড়াও কয়লাখনি শ্রমিক সংগঠনেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় মুজফফর আহমেদ পিপলস রিলিজ কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে "বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন" গঠিত হলে, তার সভাপতি হন বঙ্কিম মুখার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জ্যোতি বসু। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারত রেল ধর্মঘট সংগঠিত করার প্রস্তুতিতে বঙ্কিম মুখার্জী ও জ্যোতি বসু উত্তরবঙ্গ ও আসামে বিভিন্ন শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দেন। ঐ বছরের ১১শে জুলাই ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ডাক ও তার কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু হয়। ২৯শে জুলাই ধর্মঘটের সমর্থনে BPTUC (Bengal Provincial Trade Union Congress) এর আহ্বানে সারা বাংলায় সাধারণ

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.009.2026

ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। ধর্মঘটের দিন ধর্মতলার মনুমেন্ট ময়দানে ঐতিহাসিক সমাবেশের অন্যতম বক্তা ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী।[১৭]

কৃষক আন্দোলনে ভূমিকা

বঙ্কিম মুখার্জী কেবলমাত্র শ্রমিক দরদী নেতা ছিলেন কিংবা শ্রমিক সংগ্রামেই নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন সেকথা বলা সঠিক হবেনা। শ্রমিক সংগ্রামের পাশাপাশি কৃষক আন্দোলনের নেতা হিসেবেও তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। ভারতবর্ষে যে কয়েকজন নেতৃবৃন্দ শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামে একই সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পুরোধা ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী। ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকে তিনি শ্রমিক বিদ্রোহের সমান্তরালে কৃষক বিদ্রোহেও নেতৃত্ব দেন। গণনায়ক পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্গীয় কৃষকসভার কার্যকরী সমিতির ঘাটাল সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অ্যালবার্ট হলে বঙ্গীয় কৃষক সভার কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে দলাদলি সৃষ্টি হয় এবং দুটি বঙ্গীয় কৃষকসভার সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পর উভয়ই দলের চেষ্টায় দলাদলি অবসান হয় এবং ৩০মে উভয় দলের সম্মিলিত সভায় বাংলায় ব্যাপকভাবে কৃষক আন্দোলন চালানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সম্মিলিত কৃষক সভায় সভাপতি নির্বাচিত হন বঙ্কিম মুখার্জী।[১৮] ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুন বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে অনুষ্ঠিত জেলা কৃষক সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন করে অধিবেশনের উদ্বোধন করেন বঙ্কিম মুখার্জী। তিনি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫-২৬শে ডিসেম্বরে মহারাষ্ট্রের ফৈজপুরে কিষাণ কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক নির্বাচিত হন। সেই বছর ১৬-১৭ই আগস্ট কলকাতার অ্যালবার্ট হলে বিভিন্ন জেলার কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে কুড়িটি জেলার প্রতিনিধিরা যোগদান করেন এবং সেখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। তার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন বঙ্কিম মুখার্জী। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭-২৮শে মার্চ বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচিত হয়। কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বঙ্কিম মুখার্জী এবং সহকারি সম্পাদক মনসুর হাবিব ও অনন্ত মুখার্জী।[১৯]

১৯৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের ক্যানাল কর বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে বঙ্কিম মুখার্জী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলনের সমর্থনে তিনি বর্ধমান সদর থানার কুড়মুন গ্রামে প্রাদেশিক কৃষক সমিতির বৃহত্তর কমিটির সভায় বক্তৃতা দেন।[২০] কৃষকদের সমস্ত সমস্যা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে এই কর কৃষকদের ওপর প্রয়োগ করা অন্যায় এবং নীতি বিরুদ্ধ। সরকার শেষপর্যন্ত একর প্রতি সাড়ে পাঁচ টাকা দাবি বাতিল করে সাধারণের দাবি একর প্রতি দুই টাকা নয় আনা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন এলাকার হাড়োয়া থানার উচিলদহে কৃষকরা সংগঠিত হয়ে খাস জমির আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের বিষয় ছিল ইংরেজ পোর্ট ক্যানিং জমিদারি কোম্পানির কৃষকের জমি খাজনার দায়ে খাস করে নেওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। উচিলাদায় এক কৃষক জনসভা হয়, সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, এছাড়া নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, সৌমেন ঠাকুর প্রমুখ নেতা। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২-৩রা ডিসেম্বর হুগলি জেলার প্রাদেশিক কৃষক সভার দ্বিতীয় সম্মেলন, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৪-৫ই মে মালদা জেলার নঘরিয়ার তৃতীয় সম্মেলন এবং ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৮-৯ই জুন যশোর জেলার পাঁজিয়ায় প্রাদেশিক কৃষকসভার চতুর্থ সম্মেলনে বঙ্কিম মুখার্জী সভাপতি পরিষদের সদস্য ছিলেন। সারা ভারত কিষান সভার কুমিল্লা অধিবেশনে তিনি যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৯-৩১শে মে বিহতা সারা ভারত কৃষক সভার ষষ্ঠ সম্মেলনে "বিশ্বযুদ্ধে কৃষক সভার ভূমিকা" প্রসঙ্গে মূল প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন এবং অধিবেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২-৪ই এপ্রিল সারা ভারত কৃষকসভার সপ্তম ভাকনা সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বেজওয়াদা সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক

নির্বাচিত হন। ভূমি ব্যবস্থা, কৃষি ও কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল, যা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখার মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়। ইতিপূর্বে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে New Age পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় 'চিরস্থায়ী ব্যবস্থা' সম্বন্ধে বঙ্কিম মুখার্জীর লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যা তাঁর কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচায়ক।

দলীয় ও সংসদীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে বঙ্কিম মুখার্জী

প্রাথমিক পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় বঙ্কিম মুখার্জী রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হন। পরবর্তীকালে মতিলাল নেহেরুর নির্দেশে বাংলার স্বরাজ্য দলের হাল ধরলেও তিনি স্বরাজ্য দলের সদস্যপদ নিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকেই বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অধিক সক্রিয় ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক কৃষক-শ্রমিক সম্মেলনগুলিতে বরাবরই উপস্থিত থাকতেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বসিরহাট শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। "সেই সম্মেলনের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল কংগ্রেস সদস্যদের জন্য খদ্দরের কাপড় পরা অবশ্য কর্তব্য কিনা এই প্রশ্নে দীর্ঘ আলোচনা। খদ্দর পরার পক্ষে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিপক্ষে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী (এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালীন সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর সহপাঠী)। বঙ্কিমের বক্তব্য ছিল এই ভারতের অধিকাংশ মানুষ কৃষক, যারা মাত্র একখানা কাপড়, একটি গামছা এবং শীতকালে একটি চাদর গায়ে জড়াতে পারে কিনা সন্দেহ। এই অবস্থায় জলে-কাদায়-চাষবাসের কাজ করে। মোটা খদ্দরের কাপড় যদি একবার ভিজে যায় তাহলে দুদিন তাদের কাজে যাওয়া বন্ধ হবে এবং বর্ষাকালে তাদের ঘরে বসে কাটাতে হবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সদস্য হতে গেলে খদ্দর পরতে হবে - এই নিয়ম প্রচলিত হলে অধিকাংশ ভারতবাসী কংগ্রেসের বাইরে থাকবে।"[২১]

১৯২৮-২৯ সাল নাগাদ বাংলার বিভিন্ন চটকলগুলির শ্রমিক আন্দোলনে বঙ্কিম মুখার্জী নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং ক্রমশ শ্রমিক নেতা হিসেবে বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় তিনি মার্কসবাদে খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্তু কমিউনিস্ট দলের সদস্য হন আরো বেশ কিছু বছর পরে। জেলে বন্দি থাকাকালীন কয়েদীদের মধ্যে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রচার করেন। ১৯২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি AICC (All India Congress Committee)-র সদস্য হন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেস মানবেন্দ্র রায় গোষ্ঠীর সঙ্গে কমিউনিস্টদের দ্বন্দ্বে AITUC দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু সভা ছেড়ে চলে গিয়ে পরের দিন টাউন হলে সভা ডেকে AITUC -এর কাজ চালিয়ে যান। অপরদিকে কট্টরপন্থী কমিউনিস্টরা পরের দিন মেটিয়াবুরুজে সম্মেলন করে অল ইন্ডিয়া রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করে। এই ইউনিয়ন এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বঙ্কিম মুখার্জী, ডি.বি কুলকার্নি এবং এস.ভি.দেশপান্ডে।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্কিম মুখার্জী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে আসানসোল কোলিয়ারী শ্রমিক কেন্দ্র থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী (শ্রমিক প্রার্থী) হিসেবে বঙ্কিম মুখার্জী নির্বাচনে জয়ী হয়ে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন। তিনিই ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য যিনি এম.এল.এ নির্বাচিত হয়েছিলেন।[২২] এইভাবে তাঁর সংসদীয় রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। এম.এল.এ নির্বাচিত হওয়ার দরুন বর্ধমান-আসানসোল অঞ্চলের শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠনে তিনি সচেষ্ট হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল নাগপুরে AITUC এবং ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যৌথ সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক, কৃষক ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করার নীতি গ্রহণ করেছিল। তবে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিস্ট দলের পরাজয়ের জন্য যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মিত্রশক্তিকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও

সাহায্যের কথা ঘোষণা করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী "জনযুদ্ধের নীতি" গ্রহন করে। মিত্রশক্তির শরিক হওয়ার দরুন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে যেকোনো ধরনের ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলন, এমনকি শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগঠন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।[২৩] ফলত কংগ্রেস এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট বিরোধীদল কুৎসামূলক প্রচার চালায় যে, কমিউনিস্ট পার্টি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং ব্রিটিশের দালালে পরিণত হয়েছে। এহেন পটভূমিকায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা কি হবে সে বিষয়ে কানপুরে অনুষ্ঠিত AITUC এর সাধারণ পরিষদের সভায় (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি) বঙ্কিম মুখার্জী এক ব্যাখ্যামূলক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যেটি তৎকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ দলিল সাব্যস্ত হয়। এই প্রস্তাবনায় বলা হয় যে – "AITUC যুদ্ধের প্রতি তার নিঃশর্ত সমর্থন জানাচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে এই যুদ্ধের পূর্ণ ও দ্রুত বিজয়ের জন্য প্রয়োজন ভারতের পূর্ণ, কার্যকরী ও ঐচ্ছিক অংশগ্রহণ এবং আজ তাতে যা বাধাগুলি আছে তার অপসারণের জন্য সংগ্রাম। এজন্য AITUC তার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ও শ্রমিক শ্রেণীকে আহ্বান জানাচ্ছে নিম্নবর্ণিত নূন্যতম দাবি সমূহ আদায়ের জন্য গণআন্দোলন ও সংগ্রাম করে তুলতে-

(ক) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করতে হবে;

(খ) সমস্ত রাজবন্দী ও শ্রমিক কৃষক কর্মী যাঁরা শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য দণ্ডিত বা আটক আছেন তাদের সকলকে মুক্তি দিতে হবে;

(গ) গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুদ্ধকালীন যে সমস্ত আইনে বাক্ স্বাধীনতার, প্রকাশের, সংগঠনের, আন্দোলনের, ধর্মঘটের, গণবাহিনী গড়ে তোলার অধিকার হ্রাস করা হয়েছে তা তুলে নিতে হবে;

(ঘ) জনগণের বিশ্বাস ভাজন, জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জাতীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা দিতে হবে এবং তাঁদের হাতে যুদ্ধ পরিচালনা সমেত সমস্ত সরকারী ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে;

(ঙ) প্রদেশগুলিতে জনপ্রিয় সরকারের পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে;

(চ) যুদ্ধের প্রয়োজনে, জনগণের প্রয়োজনে ও প্রতিরক্ষার কারণে শিল্প বিকাশের বাধাগুলি দূর করতে হবে;

(ছ) শ্রমিকদের দাবি যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উৎপাদন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা ও জনগণের প্রয়োজনে বেতনের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যথার্থ মূল্যবৃদ্ধি ভাতার প্রবর্তন করতে হবে, যাতে যথাযথভাবে জীবন মাত্রার মানের উচ্চতর ব্যয় পরিশোধিত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের কারণে বরখাস্ত করা চলবে না। সরকার ও মালিকদের ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আইনগত ন্যুনতম কাজের সময় বাড়ানো চলবে না এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাতিল ও বিশৃঙ্খলার অবস্থা দূর করতে হবে। যুদ্ধ চাঁদা বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা চলবে না। অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য পুরো বেতন (সাধারণ মূল বেতন হারের দেড়গুণ) দিতে হবে।

(জ) কৃষকদের দাবি জবরদস্তি যুদ্ধচাঁদা আদায় করা চলবে না। গ্রামাঞ্চলে প্রস্তুত দ্রব্যের জন্য ও খুচরা দরের নিয়ন্ত্রণ, বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকাগুলিতে দরাজভাবে কর মকুব করতে হবে। যুদ্ধের বোঝা এমনভাবে বন্টন করতে হবে যাতে তার বেশীটা পড়ে ধনীদের উপর আর অল্পটা দরিদ্রের উপর।"[২৪]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারত রেল ধর্মঘট সংগঠিত করার প্রস্তুতিতে বঙ্কিম মুখার্জী ও জ্যোতি বসু উত্তরবঙ্গে ও আসামে বিভিন্ন শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের বাংলা আইনসভা নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে হাওড়া শ্রমিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু কংগ্রেসি গুণ্ডামির ফলে তিনি পরাজিত হন।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণঃ-

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট বহু বছর ধরে চলে আসা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনদন্ডের হাত থেকে ভারতবাসী মুক্তির স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তবে দেশের স্বাধীনতা সাথে দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যাও সামনে আসে। পাঞ্জাব ও

বাংলা এই দুই রাজ্য বিভাজিত হয়। বাংলা ভাগ হয়ে পাকিস্তানের অংশে পূর্বভাগ চলে যায়, যার নাম হয় পূর্ববঙ্গ (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়) এবং ভারতের হাতে পশ্চিম অংশটি থাকে, যার নাম হয় পশ্চিমবাংলা। অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর প্রাক্কালে পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি খুব একটা সন্তোষজনক ছিলনা। দেশভাগের নানান যন্ত্রণা পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে উত্তাল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই বাংলায় এক বৃহৎ কৃষক আন্দোলন (তেভাগা আন্দোলন) সংগঠিত হয় যার রেশ স্বাধীনোত্তর পর্বেও চলতে থাকে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ এই আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় উত্তেজক বক্তৃতা দেন বঙ্কিম মুখার্জী। এরপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। অনেকের মতো বঙ্কিম মুখার্জীও আত্মগোপনে চলে যান। এরই মধ্যে ১৯৪৭ সাল ডিসেম্বর নাগাদ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে এক নতুন যুগের সূচনা হয় যা "বি টি রনদিভে যুগ" (১৯৪৭-৫১) নামে পরিচিত। এই সময় অতি বামপন্থী ভাবাদর্শের দরুন বহু কমিউনিস্ট নেতাদের পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়।[২৫] ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নিষ্ক্রিয় এবং সংস্কারমুখী কার্যকলাপের জন্য বঙ্কিম মুখার্জিকেও কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।[২৬] ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি শারীরিক সমস্যায় ভুগতে থাকেন। এই সময় তিনি বোম্বেতে বসবাস শুরু করেন। পরের বছরেই তিনি পুনরায় সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হন। ঐ বছর (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে) তিনি রাজনৈতিক কর্মীদের জেল-এ আটকের প্রতিবাদে যে সেন্ট্রাল কমিটি গঠিত হয়, তার সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া প্রাদেশিক এবং সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। নির্বাচনে বঙ্কিম মুখার্জী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে বজবজ আসনে দাঁড়িয়েছিলেন। দীর্ঘকাল চটকল শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার দরুন তিনি শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয় মুখ হয়ে উঠেছিলেন। এর প্রভাব দেখা যায় নির্বাচনে, যেখানে তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী কালিপদ মুখার্জীকে ৭ হাজার ভোটে বঙ্কিম মুখার্জী পরাজিত করেছিলেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনেও একই কেন্দ্রে পুনর্বার জয়ী হন। এরপর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পাটনা কেন্দ্রীয় কিষানসভা এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মালাবারের কান্নানোরে কৃষক সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের 'বজবজ চটকল মজদুর' কর্তৃক গঠিত মজদুর কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বেঙ্গল চটকল ইউনিয়নের সভাপতিও নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ভাগচাষী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন এবং এর প্রতি তীব্র নিন্দা জানান। বঙ্কিম মুখার্জী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষক আন্দোলন, পেট্রোলিয়াম শ্রমিকদের আন্দোলন এবং খাদ্য আন্দোলনেও একই রকম সক্রিয় নেতৃত্ব দান করেছিলেন। বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার সূত্রে পার্শ্ববর্তী মহেশতলা অঞ্চলের দর্জি শ্রমিকদের উন্নয়নকল্পে বেশকিছু উদ্যোগ নেন এবং তাদের সংঘবদ্ধকরণেও সচেষ্ট হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন ও বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের সারাভারত কৃষক সভার সম্মেলনে সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের কমিউনিস্ট পার্টির বিজয়ওয়াড়া পার্টি কংগ্রেসের জাতীয় পরিষদের সদস্য হন। কিন্তু সেই বছরের ১৫ই নভেম্বর কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বঙ্কিম মুখার্জী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কেবল রাজনীতি নয়, বঙ্কিম মুখার্জীর সাহিত্যচর্চার প্রতিও অনুরাগী ছিলেন। অবশ্য তিনি খুব বেশি লেখালেখি করতেন না। বিজ্ঞান শাখা নিয়ে পড়াশোনা করলেও ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতির মতো নানান বিষয়ের ওপর তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় বিভিন্ন সভায় বক্তৃতাগুলি থেকে পাওয়া যায়। তিনি দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। প্রথমটি ছিল ১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে 'নিউ লাইট' পত্রিকা। এই পত্রিকায় সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় ছাড়াও নাটক নিয়ে বঙ্কিম মুখার্জী অধ্যাপক অরুন সেন এবং শিশির কুমার ভাদুড়ী সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[২৭] ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় সম্পাদক

ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী। উল্লেখ্য যে, জনযুদ্ধ পত্রিকায় ৪ই নভেম্বর ১৯৪২ সংখ্যায় তাঁর লেখা 'নভেম্বর বিপ্লব' শীর্ষক প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।[২৮] ইতিপূর্বে তিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের 'নিউ এজ' মাসিক পত্রিকায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' শিরোনামে এই ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থার কদর্য রূপ এবং এর বিলোপের প্রয়োজনীয়তার আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী শান্তা ভালেরাও-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

বঙ্কিম মুখার্জী ছিলেন একজন অতুলনীয় বাগ্মী। তিনি বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। এই জন্য অবাঙালি অর্থাৎ হিন্দি-উর্দুভাষী শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁকে ডাকা হত। তখনকার দিনে মাইক্রোফোনের ব্যবহারের চল খুব একটা ছিল না। কিন্তু তাঁর জলদ গম্ভীর স্বরে খালি গলার বক্তৃতা কয়েক হাজার শ্রোতার কানে সহজেই পৌঁছে যেত। অসংখ্য শ্রমিক ও কৃষকসভায় তিনি বক্তৃতা পেশ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু সাধারণ মানের ছিলনা, যথাযথ বিষয়ের উপর জ্ঞান, অধ্যাবসায় এবং যৌক্তিকতাপূর্ণ ভাষনের কারণে বহু মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। বিধানসভায় বিভিন্ন সময়ে বিনা বিচারে আটক আইন, পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে, বেকার সমস্যার তীব্রতা, শিল্প ও শ্রমনীতি, খাদ্য সমস্যা তীব্রতা, ভূমি সংস্কার, ভূমি অধিগ্রহণ প্রভৃতি আইন আলোচনাকালে এবং বিভিন্ন সময়ে গণ আন্দোলনের প্রতিফলন বিধানসভার ভিতরে বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যুক্তিপূর্ণ ভাবে পেশ করতেন বঙ্কিম মুখার্জী। Dictionary of National Biography- তে তাঁর জীবনী লেখক গোপাল হালদার বঙ্কিম মুখার্জীকে বক্তা হিসাবে Big Artillery বলে অভিহিত করা হত সে কথা উল্লেখ করেছেন।[২৯]

উপসংহার

বঙ্কিম মুখার্জী ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত একটি প্রবন্ধে তুলে ধরা খুবই কঠিন কাজ। তিনি আজীবন আপামর দুর্বিনীত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন – সে শ্রমিক হোক কিংবা কৃষক, আবার কখনও বা শিক্ষক। তবে বাংলার শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকাকালীন শ্রমিক-কৃষক সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বারংবার তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছিলেন। আবার মার্কসবাদী ভাবাদর্শের অনুরাগী হওয়ার সূত্রে কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে বহু ক্ষেত্রেই সুনাম অর্জন করেছেন। সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবনার বিস্তারেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিধানসভার সংসদীয় রাজনীতিতেও তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কৌতূহলের বিষয় হল যে, এমন এক মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তি যাঁর ক্রিয়াকলাপ একসময় বাংলার রাজনীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রথম জাতীয় নেতার মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলে, তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই সবকিছু যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এর কারণ সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও কয়েকটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- সুদক্ষ নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা থাকার সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে সংগঠন গঠন কিংবা তৃণমূল স্তরে সাংগঠনিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতা ছিল। খুব সম্ভবত বৃহৎ পরিসরে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার দরুন কিংবা বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্বের কারনে তাঁর নেতৃত্ব উপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। সর্বোপরি, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় আইনসভা নির্বাচনে পরাজয় হয়ত তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টি তথা বাংলার রাজনীতিতে পশ্চাৎপদ করে তুলেছিল। সেই নির্বাচনে জ্যোতি বসু কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন এবং সেই সুবাদে পার্টি সংগঠন ও দলীয় নেতৃত্বের প্রথম সারিতে চলে আসেন। যে কারনে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সত্ত্বেও বঙ্কিম মুখার্জি আর পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে পারেননি। নির্বাচনের পর বিধানসভার বিরোধীদলের প্রধান নেতা হিসেবে জ্যোতি বসুর নাম উঠে এলেও বঙ্কিম মুখার্জি সহকারী নেতার পদ পান।[৩০] তাছাড়া ১৯৫০- এর দশকে নানান শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে অনেক সময় দলীয় কাজে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। তাই হয়ত মৃত্যুর পর

আর কয়েকজন সাধারণ নেতার মতই তিনিও বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যান। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে বিধানসভায় প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। এতদসত্ত্বেও বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাকপর্বে তাঁর নেতৃত্বদান বহুলাংশে সর্বজনবিদিত এবং অবিস্মরণীয়। বর্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক বাতাবরণে বামপন্থী দলগুলির যে সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এহেন অবস্থায় বঙ্কিম মুখার্জীর মত একজন দৃঢ়, সুদক্ষ নেতৃত্বের অভাববোধ হয়ত অনেক বামপন্থী নেতারাই অনুভব করেন।

তথ্যসূত্র

১. ঘোষ, প্রশান্ত, শহীদ সোমেন চন্দ এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বঙ্কিম মুখার্জী, সম্পাদক, মজুমদার, চিত্তব্রত, *বিপ্লবী নায়ক বঙ্কিম মুখার্জি স্মারক সংকলন*, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি জন্মশতবর্ষ উৎযাপন কমিটি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৩।

২. সেন, রণেন, বঙ্কিম মুখার্জী একটি বিস্মৃত প্রায় নাম, প্রতিবেদন, *শারদীয়া কালান্তর*, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

৩. Who's Who (General Election 1957), West Bengal Legislative Assembly Secretariat, Calcutta, November 1957.

৪. বসু, নির্বাণ, বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীদের অবদান, মূল্যায়ন, সম্পা: নরহরি কবিরাজ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৪।

৫. সাহা, পরেশ, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, প্রতিবেদন, গণশক্তি, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮০, পৃ. ২-৩।

৬. WB State Archive, I.B. Bengal Police, History Sheet of Bankim Mukherjee in Police File, B.R. 8781, K.W.SI.No.214/28.

৭. সেন, রণেন, বঙ্কিম মুখার্জী একটি বিস্মৃত প্রায় নাম', প্রতিবেদন, শারদীয়া কালান্তর, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

৮. আহমেদ, মুজাফফর, *আমার জীবন ও কমিউনিস্ট পার্টি*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৪৮৭।

৯. তদেব, পৃ. ৩৪৯।

১০. *মুক্তির সংগ্রামে ভারত*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৬, পৃ. ১১৯।

১১. মোমিন, আবদুল, *কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘটের চারদিন* (১-৪ এপ্রিল, ১৯৩০), মনীষা, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৭৫।

১২. চন্দ্র, বিপান ও অন্যান্য, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৭৭।

১৩. দে, গোপীনাথ, রাজনীতি ও ট্রেড ইউনিয়নে বঙ্কিম মুখার্জীর ভূমিকা, সম্পাদক, চিত্তব্রত মজুমদার, *বিপ্লবী নায়ক বঙ্কিম মুখার্জী স্মারক সংকলন*, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি জন্মশতবর্ষ উৎযাপন কমিটি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১১৬।

১৪. অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৭।

১৫. দে, গোপীনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

১৬. ব্যানার্জি, নরেশ, প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ, সম্পাদক, মজুমদার, চিত্তব্রত, *বিপ্লবী নায়ক বঙ্কিম মুখার্জী স্মারক সংকলন*, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি জন্মশতবর্ষ উৎযাপন কমিটি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৯৩।

১৭. বসু, জ্যোতি, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, সম্পাদক, ভট্টাচার্য,তন্ময়, *আমাদের পূর্বসূরিরা প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৯।

১৮. গণনায়ক পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৩ জানুয়ারী, ১৯৩৩।

১৯. রসুল, আবদুল্লাহ, *কৃষক সভার ইতিহাস*, নবজাতক প্রকাশক, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৬১।

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.009.2026

২০. সাহেদুল্লাহ, সৈয়দ, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, সম্পাদক, মজুমদার, চিত্তব্রত, *বিপ্লবী নায়ক বঙ্কিম মুখার্জী স্মারক সংকলন,* কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি জন্মশতবর্ষ উৎযাপন কমিটি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.৬৭।

২১. প্রধান, সুধী, বঙ্কিম মুখার্জী, সম্পাদক, মজুমদার, চিত্তব্রত, *বিপ্লবী নায়ক বঙ্কিম মুখার্জি স্মারক সংকলন,* কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি জন্মশতবর্ষ উৎযাপন কমিটি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৫৭।

২২. হালিম, হাসিম, আবদুল, শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম মুখার্জী, সম্পাদক, মজুমদার, চিত্তব্রত, *বিপ্লবী নায়ক বঙ্কিম মুখার্জী স্মারক সংকলন,* কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি জন্মশতবর্ষ উৎযাপন কমিটি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১২২।

২৩. Basu, Nirban, *Political Parties & The Labour Politics: 1937-47 Special reference to Bengal,* Minerva Publication, Calcutta, 1992, pp. 59-60.

২৪. রায়, মনোরঞ্জন, *সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে ও শ্রমিক আন্দোলন,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৯১-৯৭।

২৫. রণেন, সেন, *বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮),* বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৭।

২৬. Police File Record, Op.cit.

২৭. প্রধান, সুধী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

২৮. মুখার্জি, বঙ্কিম, *নভেম্বর বিপ্লব,* প্রতিবেদন, জনযুদ্ধ পত্রিকা, ৪ই নভেম্বর, ১৯৪২ সংখ্যা।

২৯. Haldar, Gopal, Bankim Mukherjee, Edited by Sen, S.P. *Dictionary of National Biography*, 1974, vol.3, Calcutta, pp. 154-155.

৩০. হালিম, হাসিম, আবদুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।